দীর্ঘ ও সুখী জীবনে জাপানি রহস্য

ইকিগাই

হ্যাক্টর গারসিয়া
ফ্রান্সেস মিরালেস

অনুবাদ
মাসুদ শরীফ

প্রতিশ্রুতি

শুরুর কথা

ইকিগাই : কত রহস্য এখানে!

সেদিন টোকিয়োতে বৃষ্টি ঝরছিল। শহরের ছোট্ট এক পানশালায় প্রথম দেখা হলো এই বইয়ের দুই লেখকের।

আমরা একজন আরেকজনের বেশ কিছু লেখা পড়েছি; কিন্তু আগে দেখা হয়নি কখনো। হবে কীভাবে? একজন থাকি বার্সেলোনায়, আরেকজন যে টোকিয়োতে! আমাদের দুজনেরই পরিচিত একজন আমাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন। আমাদের মাঝে বন্ধুত্ব হলো। শুরু হলো এই প্রজেক্টের।

সেদিন থেকে প্রায় ১ বছর পরের ঘটনা। আমরা এক পার্কে হাঁটছি। কথা বলছি পশ্চিমা সাইকোলজি নিয়ে। লোগোথেরাপি নিয়ে আলাপ করছিলাম। এই থেরাপি অনেকের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে দিয়েছে।

কথায় কথায় আমরা বুঝলাম, ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কলের লোগোথেরাপি এখনকার থেরাপিস্টদের কাছে কেমন যেন অচ্ছুত। তারা মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য মত পছন্দ করে। কিন্তু এই যে মানুষ তার কাজকর্মে, তার জীবনযাত্রায় একটা অর্থ খোঁজে–কই এসব মত তো সেসব ধরিয়ে দিতে পারছে না। আমরা বলাবলি করছিলাম:

আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী?

আমাদের উদ্দেশ্য কি শুধু বহুদিন বাঁচা? নাকি এরচেয়ে মহৎ কোনো লক্ষ্য আমরা খুঁজব?

কিছু কিছু লোক তো দিব্যি জানে তারা কী চায়। তাদের জীবনের একটা প্যাশন আছে। কিন্তু অনেকেই তো দেখি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ঘুরপাক খায়। কেন?

এরকম কথায় কথায় একসময় রহস্যময় 'ইকিগাই' শব্দটা ভুস করে ভেসে উঠল।

শব্দটা জাপানি। শব্দটার কাছাকাছি অর্থ অনেকটা এরকম: 'সবসময় ব্যস্ত থাকার মাঝে সুখ'। কথাটা লোগোথেরাপির মতো, কিন্তু লোগোথেরাপির থেকেও

একধাপ এগিয়ে। জাপানিরা, বিশেষ করে ওকিনাওয়া দ্বীপের লোকজন যে বহু দিন বাঁচে, তার একটা কারণ এই শব্দটি। ওখানে প্রতি ১ লাখ বাসিন্দাদের মধ্যে প্রায় ২৪-৫৫ জন লোক পাওয়া যাবে যাদের বয়স ১ শয়েরও বেশি– বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে অনেক বেশি।

এখানকার লোকদের দীর্ঘায়ু নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। তারা দেখেছেন, এখানকার লোকজনদের খাদ্যাভ্যাস বেশ স্বাস্থ্যকর। তাদের জীবনযাপন সাদামাটা। এরা গ্রিন-টি খান। এখানকার আবহাওয়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। তবে এসবের সাথে আরেকটা বড় কারণ ইকিগাই। এটা এখানকার মানুষদের জীবনের গতিপথ তৈরি করে দেয়।

ইকিগাইয়ের কারণেই কি পৃথিবীর অন্য সব জায়গার চেয়ে ওকিনাওয়ায় আয়ুষ্মান লোক বেশি? কেন এত বয়স হবার পরও এটা মানুষকে সক্রিয় থাকার প্রেরণা দেয়? দীর্ঘ ও সুখী জীবনের সূত্র কী?

ইকিগাই নিয়ে আলাপ করতে করতে দেখলাম এই বিষয়টা নিয়ে মনোবিজ্ঞান বা আত্মোন্নয়ন ধারার কোনো বইতে কোনো আলাপ নেই।

বিষয়টা নিয়ে আরও গপসপ চলল। আমরা দেখলাম দ্বীপের উত্তর প্রান্তের ওগিমিতে আয়ুষ্মান লোকদের সংখ্যা আরও বেশি। এখানে লোকসংখ্যা মাত্র ৩ হাজার।

শিকুওয়াসা নামে এক ধরনের লেবুজাতীয় ফল হয় ওকিনাওয়াতে। ফলটাতে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটাও কি দীর্ঘ জীবনের কোনো কারণ হতে পারে? নাকি এখানকার পানি যে এত শুদ্ধ সেটা কোনো কারণ?

আমরা সশরীরে ওখানে যাব বলে ঠিক করলাম। সরাসরি স্থানীয়দের সঙ্গে মিশে জানব কোথায় রহস্য। আমরা ক্যামেরা নিলাম। রেকর্ডিং ডিভাইস নিলাম।

জায়গাটাতে পৌঁছেই দেখলাম এখানকার লোকজন অসম্ভব বন্ধুসুলভ। সবুজ পাহাড় আর স্বচ্ছ পানিতে ঘেরা শহরটির লোকজনের মুখে হাসি লেগেই আছে।

স্থানীয় বয়স্কদের সাক্ষাৎকার নিয়ে বুঝলাম এসব প্রাকৃতিক কারণের বাইরেও কারণ আছে। ইকিগাই হচ্ছে সেই রহস্য। কিন্তু এটা আসলে কী? কীভাবে এটা পাওয়া যায়?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওকিনাওয়া কত যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু এখানকার লোকজনদের দেখলে এখন কে সেটা বলবে? বাইরের লোকজনদের নিয়ে তাদের মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। 'ইচারিবা শোদে' নীতিকে তারা জীবনের মূলমন্ত্র বানিয়েছে। এই মন্ত্রের মানে হচ্ছে, "সবাইকে ভাই হিসেবে দেখুন– আগে কখনো যদি দেখা না-ও হয়, তবুও।"

ওগিমির লোকজনদের মধ্যে আনন্দের ফোয়ারা ছোটার অন্যতম কারণ তাদের সামাজিক জীবন। বহু আগে থেকেই তারা মিলেমিশে কাজ করায়

অভ্যস্ত। শরীর-স্বাস্থ্য ভালো রাখতে তারা বন্ধুত্বের কদর করে। হালকা খাবারদাবার খায়। যথেষ্ট বিশ্রাম নেয়। হালকা এক্সারসাইজ করে। শরীরকে সচল রাখে। কিন্তু এসব কিছুর পরও যে-জিনিসটা এখানকার আয়ুষ্মানদের রোজ স্পৃহা জাগায় সেটা হচ্ছে ইকিগাই।

জাপানি শতায়ুদের এই রহস্যটা আপনাদের সামনে মেলে ধরাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য। আপনি নিজে আপনার ইকিগাই কীভাবে খুঁজে পাবেন সেটাও জানতে পারবেন বইটি থেকে।

জীবনের লম্বা ও আনন্দময় সফরের জন্য যা যা দরকার তার সব কেবল তাদেরই আছে; যারা জানে তাদের ইকিগাই কী।

শুভযাত্রা!

হেক্টর গার্সিয়া ও ফ্র্যান্সেস্ক মিরালেস

সূচি

ইকিগাই ১১
বয়স ধরে রাখার রহস্য ১৭
লোগোথেরাপি থেকে ইকিগাই ২৭
সব কাজে গতি আনার মন্ত্র ৪১
আয়ুষ্মান গুরু ৬৩
জাপানের শতবর্ষীদের থেকে যা শিখি ৭০
ইকিগাই ডায়েট ৮০
হালকা নড়াচড়া, লম্বা জীবন ৮৯
অবিচল থাকা আর ওয়াবি-সাবি ১০৮
শেষকথা ১১৭

ইকিগাই

বয়স বাড়লেও তরুণ থাকার রহস্য

কেন বেঁচে আছেন?

জাপানিরা বলে, সবার একটা 'ইকিগাই' আছে। কেউ কেউ সেটা খুঁজে পেয়েছে। কেউ খুঁজছে। অথচ ওটা কিন্তু আছে নিজেরই মাঝে।

আমাদের সবার গহনে ইকিগাইটা লুকিয়ে আছে। খুব সময় নিয়ে খুঁজতে হবে ওটা পেতে হলে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শতায়ু লোক থাকেন ওকিনাওয়া দ্বীপে। এখানকার বাসিন্দারা বলেন, আমরা যে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জাগি, সেটা ওই ইকিগাইয়ের জন্যই।

যা-ই করুন, অবসর নেবেন না!

ইকিগাইয়ের পরিচয় ঠিকঠাক জানা থাকলে জীবনে তৃপ্তি আসে, সুখ আসে। জীবনের একটা মানে থাকে। আপনাকে আপনার ইকিগাই পেতে সাহায্য করবে এই বই। সুস্থ শরীর-মন আর আত্মা নিয়ে জাপানি জীবনদর্শন শেয়ার করবে আপনার সাথে।

জাপানের লোকজনের মাঝে একটা মজার জিনিস খেয়াল করেছেন? এরা কিন্তু অবসর নেওয়ার পরও অনেক কর্মচঞ্চল থাকে। অনেক জাপানি লোকজন তো জীবনে কখনো 'অবসর'ই নেন না। যতদিন শরীরে কুলোয়, নিজের পছন্দের কাজটি করে যান।

'অবসর' বলতে যা বোঝায়, জাপানি ভাষায় এরকম কোনো শব্দই নেই। জাপানি মানুষদের নিজের হাতের রেখার মতো চেনেন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের প্রতিবেদক ড্যান বাটেনার। তিনি বলেছেন, জাপানি সংস্কৃতিতে জীবনের একটা উদ্দেশ্য থাকা অত্যন্ত জরুরি। আমরা অবসর নিয়ে যা ভাবি, জাপানের লোকজনের মাঝে এজন্যই এরকম কিছু নেই।

চিরযুবা দ্বীপ

দীর্ঘজীবনের সূত্র নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণা থেকে বের হয়ে এসেছিল জাপানি স্বাস্থ্যকর খাবারের গুণাগুণ। তবে সাথে আরও দুটো জরুরি জিনিস খুঁজে পেয়েছে এসব গবেষণা। এর মধ্যে একটা হচ্ছে সামাজিক বন্ধনের মজবুতি। আর ইকিগাইয়ের সঠিক ধারণা। পৃথিবীর কিছু কিছু জায়গার নাম দেওয়া হয়েছে 'নীলাভূমি'। কারণ, এসব জায়গার মানুষ বাঁচে সবচেয়ে বেশি দিন। ওকিনাওয়া আর এই নীলাভূমির শতায়ুদের নিয়ে গবেষণায় বেশ কিছু চমকপ্রদ খবর পাওয়া গেছে:

- এসব জায়গার লোকজন বেশি দিন তো বাঁচেই। ক্যানসার আর হৃদ্‌রোগের মতো মরণঘাতী রোগও কম হয় এদের। অন্যান্য প্রদাহজনিত রোগও অত দেখা যায় না এদের মাঝে।
- শতায়ুদের শরীর-স্বাস্থ্য বুড়ো বয়সেও অনেক চমৎকার থাকে। অন্যান্য অঞ্চলের বৃদ্ধ মানুষদের বেলায় এমন শরীর-স্বাস্থ্য চিন্তার বাইরে।
- এদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে, রক্তে ফ্রি র‍্যাডিকেল বেশ কম (এগুলো কোষের বুড়িয়ে যাবার জন্য দায়ী)। এর কারণ, এদের চা পান। আর তারা কখনোই পেট পুরে খান না।
- মহিলাদের মাসিক বন্ধ হবার পর যেসব শারীরিক আলামত দেখা যায়, সেগুলো এদের মধ্যে অত প্রবল না। এসব অঞ্চলের পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে অনেক বয়স পর্যন্ত যৌবনের রেশ থাকে।

- বয়স বাড়লে স্মরণশক্তি ক্ষয়ে যাবার যে-রোগ, এদের মধ্যে সেটা অনেক কম।

পাঁচ নীলাভূমি

পৃথিবীতে যে-কটি নীলাভূমি আছে, তার মধ্যে সবার আগে আছে ওকিনাওয়া। এখানকার নারীরা তুলনামূলক বেশি বছর বাঁচে। অন্যান্য জায়গার নারীদের চেয়ে এদের অসুখবিসুখও হয় কম। 'দ্য ব্লু জোনস' বইতে লেখক ড্যান বাটেনার পৃথিবীর পাঁচটি নীলাভূমি নিয়ে কথা বলেছেন। একে একে দেখে নিন সেগুলো:

১. ওকিনাওয়া, জাপান (দ্বীপের উত্তর অংশে বিশেষ করে)। এখানকার লোকজনের খাবারে সবজি থাকে বেশি। আর থাকে তোফু নামের এক খাবার। তাদের দীর্ঘায়ু হবার রহস্যের পেছনে ইকিগাই ছাড়াও আছে আরেকটি কারণ। সেটা হচ্ছে মোয়াই। মোয়াই মানে একান্ত কাছের মানুষ বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে জবরদস্ত সম্পর্ক ধরে রাখেন তারা।

২. সারাদিনিয়া, ইতালি (নুরু আর অগলিয়াস্ত্রা প্রদেশ)। এখানকার লোকজনও প্রচুর পরিমাণে সবজি খান। দিনে ওয়াইন খান বড়জোর এক কি দুই গ্লাস। এখানেও লোকজনের মধ্যে সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত নিবিড়।

৩. লোমা লিন্ডা, ক্যালিফোর্নিয়া। এখানকার দীর্ঘজীবীদের নিয়ে এক গবেষণা হয়েছিল। এরা আমেরিকার অন্যতম দীর্ঘজীবী বাসিন্দা।

৪. নিকয়া উপদ্বীপ, কোস্টারিকা। ৯০ বছর পরও এখানকার বাসিন্দারা বেশ প্রাণচঞ্চল। এখানকার অনেকে ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে ঘুম থেকে উঠে মাঠে চলে যান কাজ করতে।

৫. ইকারিয়া, গ্রিস। জায়গাটা তুরস্কের উপকূলে। এখানকার প্রতি ৩ জনে ১ জনের বয়স ৯০ বছরের ওপরে। এর সঙ্গে যদি আমেরিকাবাসীর তুলনা করেন– এখানে ৯০-এর ওপর বাসিন্দা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ। ইকারিয়াকে লোকে বলে আয়ুষ্মান দ্বীপ। এখানকার মানুষজন যে লাইফস্টাইল ফলো করেন সেটা প্রায় ৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব বছর পুরোনো বলে ধারণা।

দীর্ঘজীবনের সূত্রগুলো আমরা ভেজে ভেজে দেখব সামনের অধ্যায়গুলোতে। খুঁজে দেখব কোন সে রহস্য লুকিয়ে আছে এসব

নীলাভূমিতে। আমাদের বিশেষ নজর থাকবে ওকিনাওয়াতে– লোকে যাকে বলে আয়ুষ্মান গ্রাম।

তবে, একটা কথা। এই যে ওপরে কিছু জায়গার কথা বললাম, এখানের তিনটি জায়গা কিন্তু দ্বীপ অঞ্চল। একারণে এখানে দরকারি জিনিসপত্র সীমিত। লোকজনদের তাই একে অন্যকে সাহায্য করতেই হয় বিভিন্ন দরকারে-অদরকারে। অনেকে মনে করেন, অপরকে সহযোগিতার সদিচ্ছা থেকে এখানকার বাসিন্দারা বেঁচে থাকার প্রেরণা পান। খুঁজে পান তাদের ইকিগাই।

পঞ্চ নীলাভূমি নিয়ে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এদের দীর্ঘায়ুর মূলসূত্র হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা, জীবনের একটা মানে থাকা (ইকিগাই) আর মজবুত সামাজিক বন্ধন– তার মানে তাদের বন্ধুবান্ধব পরিচিতজন অনেক। পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো।

সমাজের লোকজন দিনমানের চাপ সামলাতে সময়ের সুব্যবহার করেন। মাংস আর প্রক্রিয়াজাত খাবার খান কম। মদও খান সামান্য।[১]

নীলাভূমির লোকেরা জিমে যান না। প্রচণ্ড শারীরিক পরিশ্রম করা লাগে এমন কোনো শরীরচর্চা তারা করেন না। তবে সারাদিন তাই বলে তাদের অলস বসে থাকতে দেখবেন না। দেখবেন, তারা কাছেপিঠের দূরত্বে হেঁটে যাচ্ছেন। নিজেদের বাগান বা ফসলের খেতে কাজ করছেন নিজে। গাড়ি চালানোর বদলে হাঁটাহাঁটিতেই তাদের আনন্দ। এখানে প্রায় সবার মধ্যেই বাগানে কাজ করার গুণটি আছে।

৮০ ভাগের রহস্য

খাবার আগে-পরে জাপানিরা একটা কথা বলে: "হারা হাচি বু"–মানে, ৮০ ভাগ ভরে খাও। প্রাচীন জ্ঞানগর্ভ কথা আমাদের পেট পুরে না খাওয়ার শলা দেয়। ওকিনাওয়ার লোকজন খেতে খেতে যখন বোঝে পেট প্রায় ৮০ ভাগ ভরেছে, তারা খাওয়া বন্ধ করে দেয়। অতিরিক্ত খেয়ে শরীরকে লম্বা হজম প্রক্রিয়ায় লাগিয়ে রাখে না।

---

১ ড্যান বাটেনার। দ্য ব্লু জোনস: লেসনস ফর লিভিং লঙ্গার ফ্রম দ্য পিপল হু হ্যাভ লিভড দ্য লঙ্গেস্ট।

এখন, ৮০ ভাগ পেট ভরেছে কি না সেটা তো আসলে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু কথাটার মানে হচ্ছে, যখন খেতে খেতে বুঝব পেট ভরতে শুরু করেছে মাত্র, তখনই খাওয়া বন্ধ করতে হবে। খেতে বসলে আমরা অনেক সময় বাড়তি কিছু সাইড ডিশ নিই। লাঞ্চে পেট পুরে খাবার পরও কোনো একটা মিষ্টি খাবার না খেলে যেন হয়ই না অনেকের। এরকম অভ্যাস স্বল্প সময়ের জন্য মনে ফুর্তি দেবে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে আমাদের ভালো রাখবে না।

খাবার কীভাবে পরিবেশন করা হয় সেটাও জরুরি কম খাওয়ার জন্য। জাপানিরা তাদের খাবারদাবার বেশ কটি ছোট ছোট বাটিতে দেয়। জাপানি রেস্তোরাঁয় খেয়াল করবেন, সাধারণত একটা ট্রেতে পাঁচটি ছোট ছোট বাটিতে খাবার পরিবেশন করা হয়। তার মধ্যে চারটি বাটি তো খুবই ছোট। আর মূল খাবারটা দেওয়া হয় একটু বড় বাটিতে। চোখের সামনে পাঁচ পাঁচটা বাটি দেখলে মনে হয় বুঝি অনেক খেতে পারবেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই হয় কী–খাওয়াদাওয়া শেষ করেও খানিকটা ক্ষুধার্ত থাকেন আপনি। এজন্য দেখবেন, পশ্চিমারা জাপানে থাকলে তাদের ওজন কমে।

ওকিনাওয়ার বাসিন্দাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে গবেষণা করে পুষ্টিবিদেরা দেখেছেন, দিনে তাদের খাবারে গড়ে ১৮ শ থেকে ১৯ শ ক্যালরি থাকে। ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রের লোকজনদের খাবারে দিনে ক্যালরির পরিমাণ থাকে গড়ে ২২ শ থেকে ৩৩ শ। ওকিনাওয়ার লোকজনদের বডি ম্যাস ইনডেক্স হয় ১৮-২২। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের লোকজনদের এটা থাকে ২৬ কি ২৭।

ওকিনাওয়ার খাদ্যে সাধারণত বেশি থাকে টফু, মিষ্টি আলু, মাছ (সপ্তায় ৩ বার), আর সবজি (দিনে প্রায় ৩০০ গ্রাম)। যে-অধ্যায়ে আমরা পুষ্টি নিয়ে কথা বলব, সেখানে দেখব, এই ৮০ ভাগ খাবারে কোন কোন স্বাস্থ্যকর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার আছে।

মোয়াই: প্রাণের সাথে প্রাণের জোড়

ওকিনাওয়ার লোকজনদের মধ্যে দেখবেন, সবার সঙ্গে সবার কেমন যেন একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। এখানে লোকজনদের মধ্যে যাদের যাদের আগ্রহ, পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে মিল আছে, তারা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে একে

অন্যের খেয়াল রাখেন। নিজেদের মধ্যে তাদের আছে এক মোয়াই–সামাজিক গ্রুপ। সমাজের মানুষের দেখভাল করাই এখানকার অনেকের ইকিগাই।

বিপদাপদে একজনকে আরেকজনের পাশে দাঁড়াতে হয়। এখান থেকেই উদ্ভব হয়েছিল মোয়াই চিন্তাভাবনার। অনেক সময় খেতে ঠিকমতো ফসল হতো না। গ্রামের কিষানেরা তখন এক হয়ে বসে সলাপরামর্শ করতেন। কী করলে ভালো হবে না হবে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতেন। এভাবেই জন্ম নেয় মোয়াই।

ওকিনাওয়ার মোয়াই সদস্যরা মাসে মাসে চাঁদাও দেন। চাঁদার টাকায় তারা সভাসমিতির খরচ তোলেন। কখনো কখনো একসাথে মিলে সবাই খাওয়াদাওয়া করেন সেই টাকায়। বিনোদনের ব্যবস্থা করেন।

অনেক সময় দেখা যায় চাঁদার টাকা কিছু বেঁচে গেছে। তখন পালা করে এক-একজন সদস্যকে সেই বাড়তি টাকা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়। মোয়াই এভাবে মানসিক আর আর্থিক এক নিশ্চিন্তা দেয় লোকদের। অনেক সময়ে বিপদে-আপদে কেউ চাইলে অগ্রিমও নিতে পারেন এখান থেকে। একেক মোয়াই গ্রুপের বেলায় অবশ্য এসব রীতিতে কিছু ভিন্নতা আছে। সে যা হোক–মূলকথা, এই যে সবার মধ্যে একটা আন্তরিকতা, একজন আরেকজনের পাশে থাকার মনোভাব, তা মানুষের মনে এক নিরাপত্তার বোধ জন্মায়। তাঁদের সুস্থতা বাড়ায়।

...

সামনে আমরা দেখব, আধুনিক জীবনে মানুষজন কেন অল্পবয়সে বুড়িয়ে যায়। খুঁজে দেখব ইকিগাইয়ের জন্য তারুণ্য ধরে রাখতে কী কী করতে পারি আমরা।

বয়স ধরে রাখার রহস্য

ছোট ছোট বালুকণায় দীর্ঘ ও সুখী জীবন

বুড়িয়ে যাওয়ার গতি আর খরগোশ

মনে করুন, অনেক দূরে একটা সাইনবোর্ড। সেখানে দেখা যাচ্ছে কত বয়সে আপনি মারা যাবেন। বছরে বছরে আপনি একটু একটু করে সাইনবোর্ডটার দিকে এগোচ্ছেন। যেদিন ওটার কাছে গেলেন, সেদিন মারা যাবেন।

এখন কল্পনা করুন, সাইনবোর্ডটা একটা খরগোশ ধরে রেখেছে। আর এটা সামনের দিকে এগোচ্ছে। আপনি এক বছর বাঁচলে খরগোশটা আধা বছর করে এগোয়। এভাবেও এক সময় আপনি সাইনবোর্ডটার কাছে পৌঁছে মারা যাবেন।

কিন্তু ধরুন, যদি এমন হয়, আপনি যত বছর বাঁচছেন, খরগোশটাও সেই তালে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে? সেই খরগোশটার নাগাল কি আর পাবেন কখনো? আপনি কিন্তু তাহলে মারাই যাবেন না!

খরগোশটা যে-গতিতে সামনে এগোচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রযুক্তি। প্রযুক্তিতে আমরা যত এগোব, আমাদের শরীর সম্বন্ধে জানব, তত দ্রুত আমরা খরগোশটাকে সামনে ঠেলতে পারব।

বুড়িয়ে যাওয়াকে আমরা এক হিসেবে বিদায় দিতে পারব। ফি বছর যদি খরগোশটা এক বছর সমান বা তারচেয়ে বেশি গতিতে এগোয়, আমরা হব অমর!

রে কার্জওয়েল আর অব্রে ডি গ্রের মতো গবেষকরা তো বলেন, আমরা নাকি কয়েক দশকের মধ্যে বুড়িয়ে যাওয়া ঠেকানোর প্রযুক্তি হাতে

পাব। অবশ্য অন্য বিজ্ঞানীরা এতটা আশাবাদী নন। তারা বলেন, সর্বোচ্চ বয়স পাবারও একটা সীমা থাকবে। এর বেশি আসলে বাড়ানো যাবে না–তা সে যত প্রযুক্তিই থাক আমাদের হাতে। এই যেমন, কোনো কোনো জীববিজ্ঞানী বলেন, বয়স ১২০-এর মতো হলে আমাদের শরীরে নতুন কোষ আর জন্মায় না।

সচল মন, সজীব দেহ

একটা কথা আছে, 'সুস্থ মন, সুস্থ শরীর'। এটা কিন্তু বড় সত্য কথা। ভালো থাকতে গেলে শরীর-মন দুটোই ভালো থাকতে হবে। একটা খারাপ থাকলে আরেকটা ভালো থাকবে না। বয়স ধরে রাখতে, তারুণ্যে ভরপুর থাকতে মনটাকে সচল রাখতে হবে। মনের তারুণ্য থাকলে আপনার জীবনধারা সুস্থ হবে। আপনি অল্পবয়সে বুড়িয়ে যাবেন না।

যারা শারীরিক মেহনত করেন না, দেখবেন তাদের শরীর-মনে এর আসর পড়ে। ঠিক এরকমই, যদি 'মানসিক ব্যায়াম' না করেন, আমাদের নিউরন, নিউরাল সংযোগগুলো দুর্বল হতে থাকে। আমরা তখন দিন দিন নির্জীব হয়ে যাই। এজন্য আমাদের মস্তিষ্কেরও ঘাম ঝরানো দরকার।

নিউরোবিজ্ঞানী শ্লোমো ব্রেনিৎজ মস্তিষ্কের ব্যায়াম নিয়ে বেশ সরব। এক ইন্টারভিউতে তিনি বলেছেন, "কারও জন্য কোন কাজটা ভালো, আর তিনি কী করতে চান, এনিয়ে একটা টানাপোড়েন চলে। মানুষ–সাধারণত বয়স্করা–একটা কাজ সবসময় যেভাবে করে এসেছে, সেভাবেই করে যেতে চায়। মস্তিষ্ক যখন একটা কাজ বারবার করতে করতে ঝানু হয়ে যায়, তখন ওটা নিয়ে মস্তিষ্ককে আলাদা করে ভাবতে হয় না। কাজটা ঝটপট ঠিকঠাক হয়ে যায়–অটোপাইলটের মতো। আর এতে সুবিধাও আছে। তো, এই কারণে, রুটিন-বাঁধা কাজে ব্রেনের আগ্রহ। ব্রেনের এই তরিকা যদি ভাঙতে চান, তাহলে ব্রেনকে নতুন নতুন তথ্যের সামনে ফেলতে হবে।"[২]

২ এডুয়ার্ড পানসেট। 'রিডিস'-এর জন্য শ্লোমো ব্রেনিৎজের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, আরটিভিই রেডিয়ো টেলিভিশন এসপানোলা।

নতুন খবরে ব্রেন নতুন নতুন সংযোগ তৈরি করে। সে উদ্দীপ্ত হয় নতুন করে। মাঝে মাঝে এজন্য নিজেকে পরিবর্তনের সামনে টেনে আনতে হবে–হয়তো তাতে কিছু দুশ্চিন্তায় পড়বেন। নিজের আরামের জায়গা থেকে বের হয়ে যাবেন।

মস্তিষ্কের ব্যায়ামের কার্যকারিতা কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। শ্লোমি ব্রেনিৎজ আর কলিন্স হেমিংওয়ে এই বিষয়ে এক বই লিখছেন। নাম, 'ব্রেনপাওয়ার : চ্যালেঞ্জিং দ্য ব্রেন ফর হেলথ অ্যান্ড উইজডম'। বইতে তারা বলেছেন, "একটা কাজ আপনি এই প্রথমবারের মতো করলেন। আপনার ব্রেনে ঘাম ঝরা শুরু হলো। প্রথম প্রথম কাজটা মনে হয় কঠিন। কিন্তু এই যে কাজটা করতে শিখছেন, আপনার মস্তিষ্কে কিন্তু এক্সারসাইজ শুরু হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বারে কাজটা আর আগের মতো কঠিন লাগে না। প্রথমবারের চেয়ে কাজটা ভালো হচ্ছে। মানুষের মনমেজাজের ওপর এর প্রভাব কিন্তু চমৎকার। এভাবে আপনার যে-রূপান্তর হচ্ছে, তাতে শুধু কাজের ফলে না, আপনার নিজের ব্যাপারেও নতুন ধারণা জন্মাচ্ছে।"

'মস্তিষ্কের ব্যায়াম' কথাটা শুনতে কিছুটা ফরমাল শোনাতে পারে। কিন্তু এই যে অন্যদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে, অন্যদের সঙ্গে মিলে কিছু করছেন– যেমন কোনো গেইম খেলা–আপনাকে এটা নতুন নতুন উদ্দীপনা দিচ্ছে। একা থাকতে থাকতে যে-বিষণ্নতা ভর করে, এতে সেটা কেটে যায়।

আপনার বয়স যখন কুড়ির ঘরে, আপনার নিউরন কিন্তু তখন থেকেই বুড়িয়ে যেতে আরম্ভ করে। কিন্তু আপনি যদি বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে থাকেন, নতুন নতুন বিষয়ে কৌতূহল ধরে রাখেন, আপনার মধ্যে যদি নতুন কিছু শেখার আগ্রহ থাকে, নতুন কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলায় আপনার উদ্যমে যদি ঘাটতি না পড়ে, খেলাধুলা এবং লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতে অনীহা না জাগে, আপনি কিন্তু তাহলে নিউরনের বুড়িয়ে যাওয়া ঠেকাতে পারেন।

চাপ: আয়ু কমানোর আসামি

অনেকে আছেন, বয়স কম; কিন্তু দেখে মনে হয় অনেক বয়স। বহু লোক আছেন অল্পবয়সে বুড়িয়ে যান। কেন এমন হয়? গবেষণা বলছে, এর অন্যতম কারণ চাপ বা স্ট্রেস। মাত্রাতিরিক্ত চাপে শরীর ভেঙে যায়–দ্রুত।

হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি হসপিটালের গবেষকেরা বিষয়টা নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। তারা বয়স কম এরকম একজন ডাক্তারকে ডেকেছিলেন এক ইন্টারভিউতে। ইন্টারভিউ যেন কঠিন করা যায়, সেজন্য ডাক্তারকে তারা এক জটিল অঙ্ক দিয়েছিলেন সমাধান করতে। আর সময় দিয়েছিলেন ৩০ মিনিট। ইন্টারভিউ শেষে তারা ডাক্তারের রক্ত পরীক্ষা করেন। রক্ত পরীক্ষায় দেখেন, শরীরে রোগজীবাণু থাকলে অ্যান্টিবডি যেভাবে লড়াই করে, এই ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। যেসব প্রোটিন রোগ দমনে কাজ করে সেগুলোকে সচল করেছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে শুধু ক্ষতিকর পদার্থগুলো নিষ্ক্রিয় হয়নি; শরীরের সুস্থ কোষগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লাগাতার এরকম চাপের মধ্যে থাকলে শরীর তখন অকালে বুড়িয়ে যায়।

প্রায় একই রকমের আরেকটি গবেষণা করেছিল দ্য ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোর্নিয়া। সন্তানের অসুস্থতার কারণে মাত্রাতিরিক্ত চাপে ভোগেন, এমন ৩৯ জন নারীর তথ্য ও নমুনা নেওয়া হয়েছিল। এরপর সেগুলো তুলনা করা হয় যেসব নারীর সন্তানেরা সুস্থ, আর যারা মাত্রাতিরিক্ত চাপে নেই তাদের তথ্যের সঙ্গে। গবেষকেরা দেখলেন, টিলোমেয়ার নামক কোষের যে-গঠন, সেটা স্ট্রেসের কারণে দুর্বল হয়ে যায়। এতে করে কোষের নতুন গঠন, কোষের স্থায়িত্বে প্রভাব পড়ে। মোটকথা, স্ট্রেস যত বেশি, কোষের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব তত বেশি।

চাপ যেভাবে কাজ করে

আজকাল মানুষের জীবন চলে দুরন্ত গতিতে। প্রতিটা লোক যেন সারাক্ষণ পাল্লা দিচ্ছে একজন আরেকজনের সঙ্গে। আমাদের দেহ-মন অনুক্ষণ এত কিছুর সামনে পড়ছে, সে সবকিছুকেই দেখে সম্ভাব্য বিপজ্জনক বা সমস্যাজনক বিষয় হিসেবে। আর সেখান থেকেই তৈরি হচ্ছে চাপ। আর

সত্যি বলতে, একদিক থেকে শরীরের এরকম প্রতিক্রিয়া কিন্তু স্বাভাবিক। এ কারণে আমরা প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারি। মানব প্রজাতির বিবর্তনে আমরা এভাবেই কঠিন পরিস্থিতি সামলে এসেছি। পালিয়ে এসেছি শিকারের মুখ থেকে।

আমাদের মাথার মধ্যে এই যে বিপৎসংকেত বাজল, এতে কী হয়–আমাদের স্নায়ু পিটুইটারি গ্রন্থিকে সচল করে। এটা যেসব হরমোন তৈরি করে সেখান থেকে বের হয় কর্টিসোট্রোপিন। আমাদের সংবেদী স্নায়ুতন্ত্র ধরে আমাদের শরীরে এই কর্টিসোট্রোপিন চলাচল করতে থাকে। এরপর অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি সচল হয়ে বের করে অ্যাড্রেনালিন আর কর্টিসল। অ্যাড্রেনালিন আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি, আমাদের ধমনির স্পন্দন বাড়ায়। আমাদের মাংসপেশিকে অ্যাকশন নিতে তৈরি করে। সম্ভাব্য বিপদ মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখে দেহকে। ওদিকে কর্টিসল বাড়ায় ডোপামিন আর রক্তে গ্লুকোজ। আমরা তখন চাগিয়ে উঠি। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তৈরি হই।

আদিম মানুষ	আধুনিক মানুষ
বেশিরভাগ সময়ে শুয়ে-বসে থাকত।	বেশিরভাগ সময় কাজে ব্যস্ত। যেকোনো হুমকির ব্যাপারে সজাগ।
একদম নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে চাপ অনুভব করত।	সারাক্ষণ অনলাইন। ২৪ ঘণ্টাই সেলফোনে নোটিফিকেশনের অপেক্ষায় থাকে।
সব আশঙ্কা ছিল বাস্তব। কোনো শিকারি প্রাণী যেকোনো সময়ে তাকে মেরে ফেলতে পারে।	সেলফোন বা ই-মেইলের যেকোনো নোটিফিকেশনকে শিকারের হুমকি হিসেবে দেখে ব্রেন।
বিপদের মুহূর্তে উচ্চমাত্রার কর্টিসল আর অ্যাড্রেনালিন শরীরকে সুস্থ রাখত।	সারাক্ষণ অল্প অল্প করে কর্টিসল বইতে থাকে শরীরে। এতে শরীরে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যার আশঙ্কা তৈরি হয়। এর মধ্যে আছে অ্যাড্রেনাল ক্লান্তি, লাগাতার ক্লান্তির লক্ষণ।